দ্বিতীয় অধ্যায়

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা-গবেষণা চর্চা ঃ ১৯৭১-১৯৮০

।। এক।।

১৯৭১ থেকে ১৯৮০—এই দশকে প্রকাশিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনা সমৃদ্ধ নানাবিধ গ্রন্থাবলীর মধ্যে আমাদের আলোচ্য সমীক্ষায় নির্বাচিত স্বল্পসংখ্যক গ্রন্থের রচয়িতারা হলেন রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ তথা অধ্যাপক, সমালোচক ও বাংলা সাহিত্যের বিশিষ্ট লেখক। এদের লেখনী নিঃসন্দেহে দীপ্ত করেছে রবীন্দ্রসঙ্গীত গবেষণা, সমালোচনা ও আলোচনার বিপুল সম্ভারকে। আমরা রবীন্দ্রসঙ্গীত পিপাসুরা বারবার জানার মাঝে অজানাকে সন্ধান করার সুযোগ পেয়েছি তাঁদের সমৃদ্ধ ভাবনা আর সন্ধানের মধ্য দিয়ে।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের তাত্ত্বিক আলোচনার বাইরেও তথ্য সম্বলিত সহজ কথায় রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের উপযুক্ত করে লেখা গ্রন্থ অমল মুখোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিক্রমা', প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭১ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। আমাদের সংগৃহীত আলোচ্য গ্রন্থটি তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশিত হয় ১৯৮১ খ্রিস্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে। গ্রন্থের সূচিপত্রে রয়েছে— প্রথম অধ্যায় ঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানাদিক—ঠাকুর পরিবারের সাংগীতিক পরিবেশ ও রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে সঙ্গীতের প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের

সঙ্গীতগুরুদের পরিচয়, নানা প্রাদেশিক গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীতে পাশ্চাত্য গানের প্রভাব, হিন্দুস্থানী শাস্ত্রীয় সঙ্গীত ও রবীন্দ্রনাথের গান—ক) ধ্রুপদ ও ধ্রুপদাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত, (খ) খেয়াল ও খেয়ালাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত, (গ) রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগমিশ্রণ, (ঘ) টপ্পা ও টপ্পাঙ্গ রবীন্দ্রসঙ্গীত, (ঙ) ঠুংরী ও ঠুংরী অঙ্গের রবীন্দ্রসঙ্গীত। রবীন্দ্রসঙ্গীতে কীর্তনের সুর ও আঙ্গিকের প্রভাব, বাউল গান ও রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গান, গীতিনাট্য ঃ বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া ও মায়ার খেলা, গানের সূত্রে নাট্যের মালা ও নাট্যের সূত্রে গানের মালা, ঋতুনাট্য ঃ শেষবর্ষণ, বসন্ত, শ্রাবণগাথা, সুন্দর, নটরাজ ও নবীন। নৃত্যনাট্য ঃ চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা ও শ্যামা। নৃত্যনাট্যজাতীয় অন্যান্য রচনা ঃ শিশুতীর্থ, শাপমোচন ও তাসের দেশ। ভানুসিংহের পদাবলী। রবীন্দ্রসুরে ও তালে সৃজনীপ্রতিভা, রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিষয়বৈচিত্র্য, রবীন্দ্রনাথের ভাঙা গান, রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাণীর উচ্চারণ, রবীন্দ্রসঙ্গীতে হারমণিয়াম সহযোগ, রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিল্পীর স্বাধীনতা, প্রচলিত তাল ও রাবীন্দ্রিক তাল, রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশ, আনুষ্ঠানিক সঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ঋতুপ্রকৃতি, রবীন্দ্রসঙ্গীতে যন্ত্র-অনুষঙ্গ, রবীন্দ্রসঙ্গীতে মৃত্যুভাবনা, সহজে শিক্ষণীয় বিভিন্ন পর্যায়ের রবীন্দ্রসঙ্গীত। দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ সঙ্গীত শাস্ত্রের নানাদিক—কতকগুলি সাংগীতিক পরিভাষা, স্বরলিপি ঃ আকারমাত্রিক পদ্ধতি, হিন্দুস্থানী পদ্ধতি, বিষ্ণুদিগম্বর প্রবর্তিত পদ্ধতি। রাগ পরিবেশনের সময়, দশটি ঠাটের পরিচয় ঃ দশটি স্বরমালিকা, কয়েকটি বাদ্যযন্ত্রের বর্ণনা (তানপুরা, এস্‌রাজ, দিলরুবা, একতারা, আনন্দ-লহরী, পাখোয়াজ, তবলা ও খোল্) নির্দেশিকা।

গ্রন্থমধ্যে লেখক দুটি অধ্যায়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের পাশাপাশি রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায় সহায়ক সঙ্গীতশাস্ত্রের আলোচনা করেছেন। লেখক জানিয়েছেন যে পাণ্ডিত্যস্পর্ধী সাংগীতিক ভাষ্য রচনা তাঁর আসল উদ্দেশ্য নয়, সঙ্গীত শিক্ষার্থীদের

বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের যাতে ব্যবহারিক প্রয়োজন সিদ্ধ হয় এমন কিছু তথ্য সরবরাহ করাই গ্রন্থ রচনার মূল উদ্দেশ্য। গ্রন্থটির ভূমিকা বিশিষ্ট রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়ক অশোকতরু বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখনীতে শোভিত। রবীন্দ্রসঙ্গীতে শিল্পীর স্বাধীনতা নিয়ে লেখকের বক্তব্য হল,

> ''মূল সুর ও মৌলিক গায়কীকে অক্ষুণ্ণ রেখেও শিল্পী তাঁর নিজস্ব ঢঙ-এ গানটি গাইতে পারেন। এ-ও একজাতীয় স্বাধীনতা বৈকি। ...প্রকৃত শিল্পীর দায়িত্ব তাঁর উপলব্ধি ও পরিমিতি বোধের দ্বারা স্বরলিপির দেহে প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা। এই যে গানটিকে নিজের মতো করে উপলব্ধি করে তাকে একটি নিজস্ব ঢঙে গাওয়া, যার দ্বারা তাঁর গাওয়া গানটি অন্যের থেকে স্বতন্ত্র হয়ে উঠবে—এটাই তো একজন শিল্পীর পক্ষে কম বড়ো স্বাধীনতা নয়। ...এর জন্যে চাই রবীন্দ্রসাহিত্য ও রবীন্দ্র-জীবনদর্শনের সম্যক জ্ঞান, বিশুদ্ধ সঙ্গীতের চর্চা এবং রবীন্দ্র সুরবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে পূর্ণ ধারণা। ... রবীন্দ্ররচিত মুক্তছন্দের 'ঢালা' গানগুলিতে শিল্পীর স্বাধীনতার ক্ষেত্র অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত। ...কোথায় একটি অক্ষরকে দীর্ঘস্থায়ী সুরে দাঁড় করানো হবে, কোথায় সুরকে অতি হ্রস্ব করা হবে, কিংবা কোথায় এক ঝোঁকে কয়েকটি শব্দকে উচ্চারণ করা হবে, তা নির্ভর করে একান্তভাবেই শিল্পীর ব্যক্তিগত উপলব্ধি এবং সৌন্দর্য ও পরিমিতি বোধের উপর। ... মোটের উপর একজন অভিজ্ঞ শক্তিমান শিল্পী এজাতীয় গানে যথেষ্ট স্বাধীনতা ভোগ করে থাকেন।''[১]

রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী গানের বৈশিষ্ট্য বিচার করে লেখক তিনটি প্রধান কাল-পর্বে এ জাতীয় গানকে ভাগ করেছেন। যেমন—বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন (১৯০৫) পূর্ববর্তী কাল, ১৯০৫ এর বঙ্গভঙ্গের কাল ও বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পরবর্তী কাল। স্বদেশী গানের এ ধরনের কালবিভাগ পূর্ববর্তী রবীন্দ্রবিশেষজ্ঞরাও অবশ্য করে গেছেন। তবে গবেষক স্বদেশীগান নিয়ে চূড়ান্ত মতামতে বলেছেন—

> ''রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম ছিল বিশ্বপ্রেমেরই অঙ্গীভূত। স্বদেশকে তিনি কখনো ভৌগোলিক সীমানার দ্বারা খণ্ডিত ও বিশ্ব থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখেননি। ... রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রেম মূলক গানগুলি সকল দেশের মানুষের সর্বকালের জাগরণের গান।''[২]

রবীন্দ্রসঙ্গীতে যন্ত্রানুসঙ্গের আলোচনার পাশাপাশি হারমনিয়মের ব্যবহার নিয়ে যে মতভেদ নানা সময়ে দেখা গেছে সে সবের ঊর্ধে গিয়ে শিল্পীর কণ্ঠ মাধুরীকেই তিনি প্রাধান্য দিয়েছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছেন—

> ''নানা অলংকারের সৌন্দর্য ও নিখুঁত স্বরক্ষেপসহ গানের খাঁটি সুরটি প্রকাশ পাবে শিল্পীর কণ্ঠে—যে কণ্ঠ ইতিপূর্বেই পরিশীলিত ও মার্জিত হয়েছে। সুতরাং যন্ত্রের ব্যবহার সম্পর্কে কোনরকম গোঁড়ামি বা বাধা-নিয়মের কড়াকড়ি না থাকাই ভাল।''[৩]

তাঁর মতে গানের প্রকৃতি বা চরিত্র বুঝেই যন্ত্র ব্যবহার করা উচিত, যন্ত্র যেন সহায়ক রূপেই ব্যবহৃত হয় গানের মূল ভাবকে না ছাপিয়ে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের ক্রমবিকাশকে লেখক পাঁচটি পর্বে ভাগ করেছেন, ১৮৮১ সাল থেকে কবির মৃত্যু পর্যন্ত। কোন সাল বা তারিখ নির্দিষ্ট না করে প্রারম্ভিক পর্ব, সংগ্রহ ও সংগঠন পর্ব,

বিকাশ পর্ব, মধ্য পর্ব ও অন্তিম পর্ব এই পাঁচটি কালে রবীন্দ্রগানের ক্রমবিকাশকে সমালোচক তাঁর বক্তব্যে উপস্থাপিত করেছেন। গ্রন্থে আলোচিত বিষয়গুলি রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের সহায়ক হবে, এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায়। গ্রন্থটি সম্পূর্ণরূপে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার্থীদের পরীক্ষাবিষয়ক সহায়ক গ্রন্থ। এ ধরনের গ্রন্থের বিচিত্র ভাণ্ডারে অমল মুখোপাধ্যায়ের লেখনী ও তথ্য যথেষ্ট নির্ভরযোগ্য।

।। দুই।।

শান্তিদেব ঘোষের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭২ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে। আমাদের আলোচ্য গ্রন্থটি ষষ্ঠ মুদ্রণ, প্রকাশিত হয় ২০০৮ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। গ্রন্থের বিষয়সূচিতে আছে যথাক্রমে—রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তা, বাঙালি জীবনে বিলাতী সংস্কৃতির প্রভাব, রবীন্দ্রনাথের গানে বিলাতী সঙ্গীতের প্রভাব, গতিশীল আবেগের গান, কথা বলার রীতির গান, গুরুদেবের গানে কলি বিভাগের কয়েকটি বিশেষত্ব, রবীন্দ্রসঙ্গীতে বাংলা গানের প্রভাব, সন্ধিপ্রকাশ রাগিনী-চিন্তায় রবীন্দ্রনাথ ও পণ্ডিত ভাতখণ্ডে, গুরুদেবের স্মৃতি, রবীন্দ্রনাথ ও পল্লীসংস্কৃতি, রবীন্দ্রনাথ ও বাংলার বাউল, রবীন্দ্রসঙ্গীত সমীক্ষা, শ্রোতার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনৃত্যেনাট্যের ক্রমবিকাশ, 'তপতী' নাটক, রবীন্দ্রনাথের গানে ঠুংরির প্রভাব, রবীন্দ্রজীবনে গীতরচনার একটি অজ্ঞাত যুগ, উচ্চাঙ্গ ভারতীয় সঙ্গীতানুরাগী রবীন্দ্রনাথ ও নির্দেশিকা।

৩২১ পৃষ্ঠার এই গ্রন্থের নিবন্ধগুলি বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রস্নেহধন্য সমালোচক বুঝিয়েছেন যে, রবীন্দ্রনাথ ভারতীয় সঙ্গীত-সংস্কৃতি ও ইউরোপীয় সঙ্গীত-সংস্কৃতির ঐতিহ্যকে তাঁর সৃজনে একীভূত করে এক সমন্বয়ধর্মী ভারতীয়

রূপকে প্রকাশ করেছেন। ঊনবিংশ শতকের বাংলা সঙ্গীতের ইতিহাস ও বাংলাভাষায় রচিত গানের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে বাংলা সঙ্গীত-সংস্কৃতির স্রষ্টা যে রবীন্দ্রনাথ, তা দেখিয়েছেন সমালোচক। 'রবীন্দ্রজীবনে গীতরচনার একটি অজ্ঞাত যুগ' নিবন্ধে রবীন্দ্রনাথের ১২৯৮ বঙ্গাব্দের কোন এক সময় থেকে পরবর্তী চৌদ্দ বছরের সঙ্গীতজীবনের তথ্য সম্বলিত একটি পকেট বুকের মধ্যে পাওয়া এক অজ্ঞাত যুগকে প্রকাশ্যে এনে লেখক ধীমান গবেষকের কাজ করেছেন। তিনি বলেছেন,

> ''বহু পাতার সমষ্টি এই খাতাটিতে গুরুদেবের হাতে লেখা প্রায় ৯৩টি গান, হিন্দী-ভাঙা বাংলা গান এবং ভাঙা গানের মূল হিন্দি গানগুলি ও আছে। ... এই খাতাটি গুরুদেবের প্রায় ১৪ বছরের বাস্তব কর্মজীবন, কাব্য জীবন এবং সঙ্গীতজীবনের বিচিত্র তথ্যের ভাণ্ডার বিশেষ। ... এর অধিকাংশ গান ও কবিতাতে রচনার তারিখ এবং কি অবস্থায় কোথায় বসে লিখেছিলেন তার উল্লেখ আছে। বিশ্বভারতীর গ্রন্থন বিভাগের কর্তৃপক্ষ এই খাতাটির সাহায্যে গুরুদেব রচিত বহু কবিতা ও গানের সঠিক তারিখের উল্লেখ বা তারিখ সংশোধনের সুযোগ পেয়েছিলেন। 'পকেট বুক'টির প্রথম পরিচয় প্রকাশ করেন শ্রীকানাই সামন্ত, বিশ্বভারতীর গ্রন্থনবিভাগ কর্তৃক গৃহীত ফোটোর কপি দেখে ১৯৬০ সালে, তাঁর ''রবীন্দ্রপ্রতিভা'' গ্রন্থে।''[৪]

'গুরুদেবের স্মৃতি' নিবন্ধে রবীন্দ্র গবেষক কবির অতি বিশ্বাসভাজন রূপে প্রতিষ্ঠিত হবার কাহিনি ব্যক্ত করেছেন।

> ''১৯৩০ সালের কিছু আগে থেকে মাঝে মাঝে গুরুদেবের

কাছে একলা, নতুন গান শেখার প্রথম সুযোগ পাই। পরে, ১৯৩৫ সাল থেকে তাঁর কাছে সম্পূর্ণ একলা, একটানা গান শিখেছি তাঁর মৃত্যুর দু-এক বছর আগে পর্যন্ত। ...১৯৩৫ সাল থেকে সাধারণ গান, নৃত্যনাট্যের গান এবং গীতিনাট্যের গানের সবই তাঁর কাছে আমার শেখা।"[৫]

রবীন্দ্রসান্নিধ্যধণ্য শিল্পী ও শিক্ষক শান্তিদেব ঘোষের অভিজ্ঞতার কথা রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনাকে নিঃসন্দেহে গভীর তাৎপর্যমণ্ডিত করে তোলে। সমালোচক রবীন্দ্রসঙ্গীতের জগতে এক প্রতিষ্ঠান স্বরূপ। এই গ্রন্থে 'রবীন্দ্রসঙ্গীত সমীক্ষা' নিবন্ধে লেখকের সাহসী বক্তব্যের পরিচয় পাই এভাবে,

''গুরুদেবের গান কে গাইবে বা কার গাইবার অধিকার আছে, তা নিয়ে নানা প্রকার বাদানুবাদ শুরু হয়েছে। ...'বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত', নাম দিয়ে এক বিশেষ ধারার গানের কথা এখন প্রায়ই শোনা যায়। ...'বিশুদ্ধ রবীন্দ্রসঙ্গীত' প্রচারকেরা গুরুদেবের গানে বিশেষ এক ধরনের গায়কীর প্রয়োজন আছে বলে মনে করেন। ...রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে এ ধরনের উচ্চনীচ ভেদের চিন্তার সত্যিই কোন কারণ আছে বলে আমি মনে করি না। কেননা, গুরুদেবের গানে ভিন্ন প্রকৃতির গায়কীর যদি কিছু থাকতো এবং তার প্রয়োজন আছে বলে যদি গুরুদেব সত্যিই মনে করতেন, তাহলে নিশ্চয় তা নিয়ে কিছু না কিছু লিখে যেতেন। ... তিনি নির্বিচারে সকলকেই গাইতে উৎসাহিত করতেন।"[৬]

এই গবেষক প্রয়াত হয়েছেন ২০০০ খ্রিস্টাব্দে। প্রায় রবীন্দ্র গ্রন্থস্বত্ব বিলোপ

পাবার সময়ে। সৌভাগ্যবশত বিশ্বভারতী শান্তিনিকেতনের সঙ্গীতভবনের ছাত্র হবার সুবাদে তাঁকে দেখেছি, আর অবাক আপ্লুত হয়েছি এই ভেবে যে তিনি রবীন্দ্রনাথের প্রত্যক্ষ শিষ্য। তিনি যে সাহসী মন্তব্য ১৯৭২ সালে করেছেন তা একেবারে এই সময়কার হঠাৎ রবীন্দ্রভক্তদের আর প্রচার মাধ্যমের নানা রবীন্দ্রসঙ্গীত ভিত্তিক কিছু অরাবীন্দ্রিক অনুষ্ঠানের কথা মনে করিয়ে দেয়, যে পরিবেশনায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী অনুপস্থিত। রবীন্দ্রসঙ্গীত নিয়ে যারা যত্রতত্র শিক্ষাদানে রত আর যারা রবীন্দ্রসঙ্গীতের পঠন পাঠনে যথার্থভাবে নিযুক্ত, তাঁদের কাছে লেখকের উক্তিটি একটু অসুবিধাজনক বলে মনে হলেও হতে পারে। রবীন্দ্রনাথ তাঁর গানের গায়কীর কথা বলে যাননি, কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীতের মত বিষয়, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমভুক্ত, রবীন্দ্রসঙ্গীত জাতীয় স্তরের পরীক্ষার অন্তর্ভুক্ত, রবীন্দ্রসঙ্গীত বাণীর গভীরতা ও সুরের মাধুর্যে অতুলনীয় একটি শিল্প যেখানে বহুদিন ধরে চর্চার ফলে রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়নরীতি প্রতিষ্ঠিত। রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইতে গিয়ে তাঁর গায়কী যদি গায়ক বা গায়িকার কণ্ঠে ফুটে না ওঠে তা হলে তো উপস্থাপনা রসহীন হয়ে উঠবে। অতএব রবীন্দ্রসঙ্গীত সকলেই গাইবেন, কিন্তু দীর্ঘদিন রবীন্দ্রসঙ্গীতের ধারায় শিক্ষিত হয়ে যথার্থ গায়কী নিয়ে গাইবেন, এটাই কাম্য। আজকালকার কিছু কিছু পরিবেশনায় গায়কীর নমুনা দেখে রবীন্দ্রনাথের গান বলে চিনতে অসুবিধে হয়। মনে হয় কথা ও সুর রবীন্দ্রনাথের আর বাকীটা গায়ক বা গায়িকার। শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ-এর গায়নশৈলীও কিন্তু রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়কীর এক আদর্শ ঘরানা বা নমুনা, যা বহু স্বনামধন্য শিল্পীর গায়কীর মাধ্যমে বেঁচে আছে। এই গ্রন্থের 'রবীন্দ্রসঙ্গীত সমীক্ষা' আর 'শ্রোতার দৃষ্টিতে রবীন্দ্রনাথ' নিবন্ধে লেখকের আরও কিছু মতামত হল—

> ''রবীন্দ্রসঙ্গীত গাইবার অধিকার সকলেরই আছে, সকলেই গাইবার চেষ্টা করবে, নিজের সুখ-দুঃখের প্রয়োজনে। কিন্তু কেবল পোষা পাখীর মত মুখস্থ করে গেয়ে যাওয়াটাই মুখ্য

হবে না। উদ্দেশ্য হবে, নিজে গান গেয়ে গানের রসে মনকে মজিয়ে তোলা। এইভাবে নিজেকে গানের রসে রসিয়ে নেবার সামর্থ্য থেকেই রসিক শ্রোতারা তা শুনে পাবে তৃপ্তি। এই হলো সব গানেরই শেষ কথা।”[৭]

লেখকের আরও বক্তব্য হল,

‘‘গুরুদেবের গান গাইতে গেলে, গানের সেই সেন্টিমেন্টের সঙ্গে অন্তরঙ্গ পরিচয় থাকা দরকার... রবীন্দ্রসঙ্গীতের শব্দবিকৃতি বা ভুল শব্দে গাওয়া কিংবা অমার্জিত উচ্চারণ বিষয়ে সতর্ক থাকা প্রয়োজন। ... যদি কেউ ইচ্ছামত চলতে চান, তবে বাংলাদেশের শ্রোতারা তাঁকে গাইয়ে বলে কখনই স্বীকার করবে না।”[৮]

রবীন্দ্রসঙ্গীত আলোচনার সমীক্ষায় লেখকের এই সব অভিমত আমাদের সকলের জন্যেই যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি তাৎপর্যবাহী।

।। তিন।।

রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ কিরণশশী দে-র ‘রবীন্দ্রসঙ্গীত সুষমা’ গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। সংগৃহীত আলোচ্য গ্রন্থটির পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসে। গ্রন্থটির সূচিপত্রে উল্লেখিত আলোচ্য বিষয় হলো— উৎসর্গ পত্র, ভূমিকা, প্রকাশকের নিবেদন, লেখকের নিবেদন, দ্বিতীয় সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি, চতুর্থ সংস্করণের বিজ্ঞপ্তি, ঠাকুর পরিবারের সাঙ্গীতিক

পরিবেশ (রাজা রামমোহন।। প্রিন্স দ্বারকানাথ।। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ) ব্রহ্মসঙ্গীতের উৎপত্তি, রবীন্দ্রনাথের বাল্যজীবনে সঙ্গীতের প্রভাব—দ্বিজেন্দ্রনাথ, সত্যেন্দ্রনাথ, হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সোমেন্দ্রনাথ, বিষ্ণু চক্রবর্তী, শ্রীকণ্ঠ সিংহ, কিশোরী চাটুজ্যে, অক্ষয় চৌধুরী, বিহারীলাল চক্রবর্তী, যদুভট্ট, নাম-না-জানা গায়ক, রাধিকা গোস্বামী। রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিচয়—কবি রচিত গানের সংখ্যা, সুর সৃষ্টিতে কবির আত্মবিশ্বাস।

ভানুসিংহের পদাবলী—রবীন্দ্রসঙ্গীতে বৈষ্ণব পদাবলীর প্রভাব।

সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের স্বদেশপ্রীতি—জাতীয় বৈশিষ্ট্যের মর্যাদা রক্ষায় ঠাকুরপরিবার, হিন্দুমেলা, সঞ্জীবনী সভা, রাখিবন্ধন, জনগণমন-অধিনায়ক, আমায় বোলো না গাহিতে, 'বন্দেমাতরম' গানে সুরারোপ প্রসঙ্গ। রবীন্দ্রনাথের গান প্রাদেশিক ও পাশ্চাত্যসঙ্গীতের প্রভাব গ্রহণের শক্তি ও দানের শক্তি, সুর সংযোজনায় কবির লক্ষণীয় নৈপুণ্য, প্রভাব, প্রেরণা।

রবীন্দ্রনাথের গীতিনাট্য ও নৃত্যনাট্য—বাল্মীকি প্রতিভা, কালমৃগয়া, মায়ার খেলা, চিত্রাঙ্গদা, চণ্ডালিকা, শ্যামা।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য—গানের মধ্যে কথা, শব্দ, অক্ষর ও সুরের তারতম্য বিচার, উচ্চারণ শিক্ষায় আদর্শের অভাব, পরিবেশের অভাব, গান গাওয়া এবং অভিনয় করা এক জিনিষ নয়, ঠাকুরবাড়ির ভাষা, কবিগুরুর পরিবেশ এবং আমাদের পরিবেশ, রবীন্দ্রসঙ্গীত কেন জমে না, আসরে যদি থাকে হিন্দী গান, রবীন্দ্রনাথকে গাইতে শুনেছেন যাঁরা-তাঁদের বিবৃতি, ক্ষিতিমোহন সেন। শিল্পাচার্য অবনীন্দ্রনাথ, সিস্টার নিবেদিতা। সুখরঞ্জন রায়। কবি নবীনচন্দ্র সেন, প্রমথ চৌধুরী (বীরবল)। ইন্দিরা দেবী চৌধুরাণী। ক্লায়াবাট্, ডঃ কালিদাস নাগ। রথীন্দ্র নাথ। H. Bose's Pathephone রেকর্ড তালিকা পুস্তকে ১৯০৬ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত বর্ণনা,

কবিকণ্ঠ, বানানের বিশুদ্ধ রূপ-রক্ষার ক্ষেত্রে উদাসীনতা, গোড়া কেটে আগায় জল, গান গাওয়া, গান পড়া, গান লেখা, সাধনার ক্রমোন্নতি আপন আপন পরিবেশের উপর নির্ভরশীল, কবিকণ্ঠ অবশ্য শ্রোতব্য।

রবীন্দ্রনাথের গুরু পরম্পরা।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি ও শিল্পীর স্বতন্ত্রতা—

কবিগুরুর উদ্বেগ, স্বরলিপি, কথালিপি বা ভাষালিপি, গায়কি, কথকি, 'প্রামাণ্য স্বরলিপি' শব্দের ব্যাখ্যা, যে কোনো গানে আরোপিত সুরের নির্ভুলতা বিচার, রবীন্দ্র-রচিত সুরের দলিল, স্বাধীনতা ও যথেচ্ছাচারিতা, উৎকর্ষ সাধকের প্রতি রবীন্দ্রনাথ, গানের কথা এক সুরও এক—তবু এর প্রকাশভঙ্গীতে ভেদের সৃষ্টি হয় কেন? কণ্ঠমার্জনা প্রসঙ্গ, আবৃত্তির মাহাত্ম্য।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে কীর্তন ও বাউলের প্রভাব—সঙ্গীত রচনায় নতুন পথ, রবীন্দ্রনাথের দেশিগান শিক্ষার সূত্র, সুরের তান এবং কীর্তনের আখর, রবীন্দ্রসঙ্গীতে আধ্যাত্মিকতা।। সংসারী রবীন্দ্রনাথ, 'মনের মানুষ', রবীন্দ্র -কীর্তন, রবীন্দ্র-বাউল, শান্তিনিকেতন-ব্রহ্মচর্যা শ্রম।। বিশ্বভারতী।

সঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথের সুর ও তাল সৃজন প্রতিভা—

কবিগুরুর মনোবাঞ্ছা, আমাদের চিন্তায় ও কাজে সামঞ্জস্যের অভাব, কয়টি প্রচলিত তালের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা-দাদ্‌রা।। কাহারবা বা কার্ফা।। ত্রিতাল।। চৌতাল।। একতাল।। ঝাঁপতাল।। সুরফাঁকতাল।। তেওরা বা তীব্রা।। আড়াচৌতাল।। ধামার তাল।। সমচলনের ছন্দ।। অসমচলনের ছন্দ।। বিষমচলনের ছন্দ, ঝম্পক।। ষষ্ঠী।। রূপক্‌ড়া।। নবতাল।। একাদশী।। নবপঞ্চ তাল, রবীন্দ্রসঙ্গীতে তাল-সঙ্গত, রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়ক-গায়িকা ও সঙ্গতকার, আর্টিষ্ট এবং টেক্‌নিশিয়ান্।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে হিন্দুস্তানী গানের প্রভাব—অনিয়মের ভিতর রবীন্দ্রনাথের গান শিক্ষা, রবীন্দ্রনাথের জ্ঞান ও সাধারণ বিদ্যার্থীর জ্ঞান, গীত-সাধকদের সম্পদ।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য—পূজা।। প্রেম।।প্রকৃতি, গান, ছবি, কবিতা, ভাষা।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে রাগরাগিনী ও তালের নাম-নির্দেশ প্রসঙ্গ রাগরাগিনী এবং তালের নাম নির্দেশিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের তালিকা।

বিষ্ণু চক্রবর্তী, যদু ভট্ট, দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

পরিশিষ্ট।

১৮৪ পৃষ্ঠার 'রবীন্দ্রসঙ্গীত সুষমা' গ্রন্থটির সূচিপত্র বিন্যাস এ গ্রন্থভুক্ত খুঁটিনাটি বিষয়গুলিকে লেখক কতকগুলি বিশেষ শিরোনাম নির্দেশ করে অধ্যায়রূপে সাজিয়েছেন। সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভূমিকার জন্য গ্রন্থটির শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছে। গ্রন্থকারের নিবেদন থেকে জানা যায় যে লেখকের পূর্বে রচিত 'রবীন্দ্রগীতি প্রবাহ'র ১ম ও ২য় ভাগে সন্নিবিষ্ট বিষয়সমূহের পরিবর্তিত এবং পরিবর্দ্ধিত রূপ বর্তমান গ্রন্থ।গ্রন্থটি এককালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বাংলা ও বাংলার বাইরের একাধিক অনুমোদিত সঙ্গীত শিক্ষাকেন্দ্রে পাঠ্যপুস্তক হিসেবে স্বীকৃত। ২য় ও ৪র্থ সংস্করণের বিজ্ঞপ্তিতে লেখক জানিয়েছেন যে গুরুদেবের গান প্রসঙ্গে ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা প্রকাশের একটা নৈতিক কর্তব্যের তাগিদেই ১৯৭২-৭৩ সাল 'রবীন্দ্রসঙ্গীত সুষমা' গ্রন্থের সূচনা। প্রতিটি অধ্যায়ের আলোচনায় লেখকের এই ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার ছোঁয়া পাওয়া যায়। একদা রামমোহনের ব্রহ্মসঙ্গীতে যে ধারার সূচনা হয়েছিল বাংলা সঙ্গীতে, সেই ধারাটি কীভাবে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ এবং তাঁর সন্তানদের বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের হাতে এসে নতুন সুরসৃষ্টিতে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছিল, লেখক তারই

খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করেছেন। প্রতিটি রচনাকেই লেখক সমৃদ্ধ করেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মন্তব্যে। গবেষক স্বদেশী আন্দোলন সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের পূর্বে ও সমসাময়িককালে রচিত স্বদেশী গান সৃজনের মধ্য দিয়ে। ১৯০৬ সালে H. Bose's (রথীন্দ্রনাথের বন্ধু হেমেন্দ্রমোহন বসু) PATHEPHONE রেকর্ডের সন্ধান দিয়ে লেখক রবীন্দ্রগীতানুরাগীদের আগ্রহ ও কৌতূহল নিরসন করেছেন। রবীন্দ্রনাথের গানে বাউল, কীর্তন, হিন্দুস্থানী, প্রাদেশিক ও পাশ্চাত্য সঙ্গীতের প্রভাবের আলোচনায় আলোচক রবীন্দ্রনাথের নানা বক্তব্য ও গানের বিশ্লেষণ করেছেন। অসামান্য শিল্প প্রতিভার গুণে নানাদেশের নানা সুর থেকে রবীন্দ্রনাথের সুরসৃষ্টি ও প্রেরণালাভের ইতিহাস, যা অনুকরণ বা নকলনবিশী দ্বারা সৃষ্টি হয় না। 'স্বরলিপি ও শিল্পীর স্বতন্ত্রতা', 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের উচ্চারণ বৈশিষ্ট্য' ইত্যাদি রচনার মধ্যে লেখকের বিভিন্ন মতামত রবীন্দ্রসঙ্গীতের চর্চায় দিক নির্দেশ করে। যেমন—

> ''স্বরলিপিকেই রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষার ও চর্চার সর্বোৎকৃষ্ট মাধ্যম বলে আমাদের মধ্যে সর্বত্র মেনে নেওয়া উচিত। ... স্বরলিপি লিখন পঠনের বিদ্যা সম্পূর্ণ আয়ত্তে থাকলে যে কোনো গায়কের পক্ষে রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চা করা তেমন অসম্ভব ব্যাপার কিছু নয়। ... যতদিন কোন গায়ক রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখবেন ততদিন তিনি অবিমিশ্র শিক্ষার্থী, এ কথা মনে রেখে তাঁকে স্বরলিপির ছকে বাঁধা নিয়মের দাগে দাগে পা ফেলে চলার ট্রেনিং নিতেই হবে''[৯]

তাছাড়া আরও বলেছেন,

> ''...রবীন্দ্রসঙ্গীত তো শুধু সুরধর্মী নয় এর সুরের সঙ্গে যে

আবার কথাও চলে পাশাপাশি সমান মর্যাদা নিয়ে। কাজেই এখানে সুর-আবৃত্তির অনুরূপ কথা-আবৃত্তির প্রতিও গায়কদের সমান মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। ... উত্তম ও সার্থক আবৃত্তির মাধ্যমে গানের অর্থ, ভাব ও রস উপলব্ধি করে রবীন্দ্রসঙ্গীত গায়কেরা কিংবা তথাকথিত বিশেষজ্ঞরা রবীন্দ্রসঙ্গীতে যে প্রাণবন্ত রূপটি তাঁদের নিজ নিজ পরিবেশন অনুযায়ী ব্যক্তিগত দরদ, গায়কি ও বৈশিষ্ট্যের সংমিশ্রণে ফুটিয়ে তোলেন— বলাবাহুল্য সেই রূপটাই হল—গায়কশিল্পীর স্বতন্ত্রতা।"[১০]

উচ্চারণ নিয়ে লেখকের বক্তব্য এরকম,

"রবীন্দ্রসঙ্গীতে উচ্চারণ-বৈশিষ্ট্য অভ্রান্তরূপে জানবার এবং বুঝবার সহজতম পন্থা হল—কবিকণ্ঠ স্বকর্ণে শুনে রাখা... স্বয়ং কবি রবীন্দ্রনাথের কণ্ঠ নিঃসৃত উচ্চারণ যে করেই হোক আমাদের সর্বতোভাবে শ্রোতব্য; এবং সেটা যাতে অনুকরণীয় না হয়ে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর কাছে অনুশীলনীয় বিষয় হতে পারে—সেই দিকেও দৃষ্টি রাখা সমানভাবে অবশ্যকর্তব্য।"[১১]

কিরণশশী দে, দিন্দ্রেনাথ ঠাকুরের ছাত্র ও রবীন্দ্রনাথের সান্নিধ্যলাভের সৌভাগ্য-অর্জনকারী। আজীবন রবীন্দ্রসঙ্গীতের শিক্ষক কিরণশশী দে তাঁর সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার আলোকে শিক্ষার্থীদের উপযোগী বিষয় নির্বাচন করে, নিবন্ধগুলিকে তথ্য সমৃদ্ধ করে পরিবেশন করেছেন এই গ্রন্থে। গ্রন্থটি রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনা-গবেষণার ইতিহাসে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ, সন্দেহ নেই।

আবু সয়ীদ আইয়ুব-এর 'পান্থজনের সখা' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ খ্রিস্টাব্দের ২রা অক্টোবর। সংগৃহীত আলোচ্য গ্রন্থটি ১৯৯৭ সালের ডিসেম্বরে প্রকাশিত ষষ্ঠ সংস্করণ। গ্রন্থের সূচিতে রয়েছে সূচনা, রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান, পদ্মের মাঝখানে বজ্র, সখেব সখ্যুঃ, এ দুর্লভ প্রেম, প্রেমের দুই রূপ—চণ্ডালিনীর ঝি ও রাজেন্দ্রনন্দিনী, পান্থজনের সখা-১. তব চরণতলচুম্বিত পন্থবীণা, ২. মনের মানুষের সন্ধানে ৩. পদধ্বনি কার পদধ্বনি ৪. শুধু ধূলি, শুধু ছাই।

১৮৬ পৃষ্ঠার গ্রন্থে লেখকের মন্তব্য থেকে জানা যায় যে 'সূচনা' ছাড়া বাকী নিবন্ধগুলি গ্রন্থপ্রকাশের পূর্বে 'দেশ' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছিল। বইটির উদ্দেশ্য নিয়ে লেখক বলেছেন,

> "... আমার উদ্দেশ্য ভাষান্তর নয়, ব্যাখ্যান বা বিস্তার নয়। উদ্দেশ্য ছিলো রবীন্দ্রনাথের গান কবিতা ও নাটকের পিছনে যে জগৎনিরীক্ষা এবং ঈশ্বরভাবনার পটভূমিকা কখনো স্পষ্ট গোচর কখনো আবছা রয়েছে, তারই স্বরূপ সন্ধান। ... যে রবীন্দ্রনাথকে আমি মর্মে মর্মে পরম আত্মীয় বলে জেনেছি, "চিরসখা" বলে ভালোবেসেছি, তাঁরই কথা বলতে উৎসাহ বোধ করেছি এখানে।"[১২]

লেখক নিজেকে 'পান্থজন' হিসেবে আখ্যায়িত করে রবীন্দ্রনাথকে বিশেষিত করেছেন পান্থজনের সখা রূপে। গ্রন্থের অনেকগুলি নিবন্ধের অন্তর্মূল্যায়নে গীতাঞ্জলি পর্বের গানগুলি পরতে পরতে উপস্থাপিত হয়েছে। আইয়ুব রবীন্দ্রনাথের বিচিত্র সৃষ্টিশৈলীর মধ্যে গানের ফসলকেই সবচেয়ে মূল্যবান এবং কালজয়ী মনে করেন। রবীন্দ্রনাথের নানা ভাবের গানের মধ্যে দুঃখের গানই লেখকের সবচেয়ে ভালো লাগে। লেখক রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর মাধুরীকে অগ্রাহ্য করেন না, কিন্তু তাঁর মতে

রবীন্দ্রসঙ্গীতে সুর হচ্ছে 'রথ', 'সারথি' নয়। এখানে সুরের কাজ হচ্ছে কথার ব্যঞ্জনা, আর ভাবকে মর্মে পৌঁছে দেওয়া। অবশ্য কিছু কিছু রবীন্দ্রগানে কথা ও সুরের পার্বতী পরমেশ্বর মিলন লেখক উপলব্ধি করেন এবং সেই গানগুলিকেই মনে করেন সর্বোৎকৃষ্ট। লেখকের বক্তব্য হল যে রবীন্দ্রসঙ্গীতে পরিশীলিত আর সুরেলা কণ্ঠ থাকলেই চলবে না, রবীন্দ্রগানে বাণীর যথাযথ প্রকাশ যে উপস্থাপনায় থাকবে না বা বাণীর মর্যাদা কম দিয়ে যারা সুরের প্রতি বেশি নজর রাখেন, রবীন্দ্রসঙ্গীত তাঁদের জন্য নয়। এ কথা শ্রোতা, শিল্পী উভয়ের জন্যেই প্রযোজ্য। প্রচুর গানের উপমায় লেখকের উপলব্ধির প্রকাশ দেখা যায় 'রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গান' নিবন্ধে। যেমন, 'সকল জনম ভরে ও মোর দরদিয়া' গানটির ব্যখ্যায় তিনি বলেছেন,

> ''কতো বিচিত্র ও কী অপরূপ এই স্পর্ধার প্রকাশ তাঁর গানে। প্রধানত এই কারণেই তাঁর ভক্তিপর্বের ও প্রেমপর্বের শ্রেষ্ঠ গানগুলির মাঝখানে কোনো সীমারেখা টানা যায় না। প্রেম অলক্ষ্যে উঠে গিয়ে মিলেছে ভক্তির সঙ্গে, ভক্তি অলক্ষ্যে নেমে এসে ঘর করেছে প্রেমের সঙ্গে।''[১৩]

লেখকের মতে রবীন্দ্রনাথের দুঃখের গানে দুঃখের অনুভূতি শুধু ব্যক্তিগত নয়, সর্বজাগতিক। 'চিত্রাঙ্গদা' অর্জুনের ভালোবাসার সন্ধান পেয়েও দুঃখী, কারণ অর্জুন তার বাহ্যিক সৌন্দর্যকে কেবল দেখেছে, অন্তরকে দেখেনি। লেখক লক্ষ্য করেন 'গীতাঞ্জলি'তে রবীন্দ্রনাথ প্রেমের শত দুঃখের কথা গেয়েছেন শতবার। 'গীতাঞ্জলির' 'প্রভু তোমা লাগি' গানের 'দেখা নাই পাই/ ব্যথা পাই/সেও মনে ভালো লাগে'—এখানে দুঃখও ভালো লাগায় কবিকে। এই গ্রন্থের নিবন্ধগুলিতে আইয়ুব দেখিয়েছেন রবীন্দ্রনাথের গান কিভাবে চরিত্রোপযোগী হয়ে উঠেছে নাটকে প্রযুক্ত হয়ে। লেখকের মতে কথা ও সুরের যুগল মিলনে 'শ্যামা' রবীন্দ্রনাথের

শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। তাঁর মনে হয়েছে 'শ্যামা'তে নৃত্য অসম প্রতিদ্বন্দ্বী। 'চিত্রাঙ্গদা' 'চণ্ডালিকা' ও 'শ্যামা' তিনটি নৃত্যনাট্যেই প্রেমের তত্ত্ব আলোচিত হয়েছে। আইয়ুবের নিরীক্ষায় চিত্রাঙ্গদা আর শ্যামায় রয়েছে রোম্যান্টিক প্রেমের পরাকাষ্ঠা আর চণ্ডালিকা'য় তাঁর স্বাতিক্রমণ। লেখক বলেছেন,

> ''চিত্রাঙ্গদা মিলনান্ত নাটিকা, চণ্ডালিকা'কে ট্যাজেডির ভারতীয় সংস্করণ ভাবা যায় হয়তো। পরিসমাপ্তি তার চূড়ান্ত বিচ্ছেদে, কিন্তু চূড়ান্ত দুঃখে নয়... পরিণাম তার মৃত্যু নয়, অমৃত।"[১৪]

রবীন্দ্রনাথের গানে 'মৃত্যু' প্রসঙ্গে আইয়ুব 'সখেব সখ্যু' প্রবন্ধে রবীন্দ্র কাব্য নাটকে মৃত্যুর রূপের আলোচনা করেছেন। তাছাড়া 'গীতাঞ্জলি'র গানেও রবীন্দ্রনাথের মৃত্যু চেতনাকে লক্ষ্য করে লেখক মনে করেন যে রবীন্দ্রনাথ ভীষণের মধ্যে মধুরের এবং মধুরের মধ্যে ভীষণকে অনুভব করেছেন। মৃত্যুর মধ্যে তিনি ঈশ্বরের স্পর্শ পান। তাই লেখকের অন্তরে রবীন্দ্রনাথ দুঃখের কবি, মৃত্যুর কবি হয়েও আনন্দের কবি, অমৃতের কবি। আবু সয়ীদ আইয়ুবের মত বাংলা সাহিত্যের একজন বিদগ্ধ পণ্ডিতের রচিত এই গ্রন্থ রবীন্দ্রসঙ্গীতের আলোচনার ইতিহাসে আমাদের নতুন করে সঙ্গীতের মর্মলোকে পৌঁছায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত সম্বন্ধে আমাদের ভাবনায় স্বচ্ছতা এনে দেয়। রবীন্দ্রনাথের গান শুধু সুরে তালে নিবদ্ধ নয়, এর কথার মধ্যে যে গভীর দর্শন ও সাহিত্যরস নিহিত তা যেন চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন এই গ্রন্থের বিশ্লেষণে।

।। চার।।

অমিয়কুমার সেন ও নীলিমা সেন রচিত 'সুরের গুরু' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে। গ্রন্থ মধ্যে আলোচিত বিষয়সূচিতে রয়েছে— রবীন্দ্রসঙ্গীত ও সংস্কৃতি, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সাহিত্যরূপ, রবীন্দ্রনাথের শিক্ষাসাধনায় সঙ্গীতের স্থান, রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাকৃতিক পরিবেশ, রবীন্দ্রনাট্যের গানে আশ্রম পরিবেশ, রবীন্দ্রসঙ্গীতে কীর্তন, রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত ও নৃত্যনাট্য, রবীন্দ্রনাথের পূজার গান, রবীন্দ্রনাথের গানের গান। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক অমিয়কুমার সেন এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী ও শিক্ষিকা নীলিমা সেনের গ্রন্থের দশটি নিবন্ধের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের গানে সংস্কৃতি, সাহিত্য, শিক্ষাসাধনায় রবীন্দ্রসঙ্গীত, প্রাকৃতিক পরিবেশ, রবীন্দ্রনাট্যের গান বিষয়গুলির মাধ্যমে রবীন্দ্রমননে সঙ্গীত এবং শান্তিনিকেতনের প্রাকৃতিক পরিবেশে রবীন্দ্রনাথের সৃজন প্রতিভাকে উপস্থাপিত করেছেন।

রবীন্দ্রসঙ্গীতে কীর্তন, স্বদেশীসঙ্গীত, নৃত্যনাট্য, পূজার গান, গানের গান ইত্যাদি বিষয়ের অবতারনায় লেখকদ্বয় রবীন্দ্রনাথের মৌলিকতার দিকটি তুলে ধরেছেন। লেখকদ্বয় রবীন্দ্রনাথের পূজা পর্যায়ের গানের মধ্যে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে গানের পরিবর্তিত রূপ লক্ষ করেছেন। তাঁদের দৃষ্টিতে ধরা পড়েছে বৈষ্ণব ও বাউলতত্ত্বের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের ঈশ্বরপ্রেমের মিল। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীত সৃষ্টির আলোচনায় লেখকদ্বয় বলেন, প্রথম জীবনে রবীন্দ্রনাথ হিন্দুস্থানী সুরের প্রভাবে সঙ্গীত সৃষ্টি করলেও পরবর্তী জীবনে কীর্তন, বাউল, রামপ্রসাদী, ভাটিয়ালী, সারি গানের সুরের প্রভাবই বেশি, আর এদের মধ্যে বেশিরভাগ গানই কীর্তন ও

বাউল—এই দুটির মিশ্রণজাত সুরে। লেখকদের ভাবনায় ধরা দেয় যে রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যগুলির সঙ্গীতের সঙ্গে নৃত্যের রয়েছে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক, এখানে কবি পরিপূর্ণ রূপে সঙ্গীতকে নৃত্যনাট্যে যুক্ত করে নাট্যরস সৃষ্টি করেছেন। লেখকদের আলোচনায় বর্ণিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের এক প্রগাঢ় সাহিত্য ও সংস্কৃতিবোধ। তাঁদের কথায়—

> ''দুজনের (কথা ও সুর) স্বতন্ত্র মর্যাদা আছে, কিন্তু দুজনের মিলিত মর্যাদার তাৎপর্য সীমাহীন। রবীন্দ্রসঙ্গীত এই সীমাহীন তাৎপর্যের ঘননিবদ্ধ রূপ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের দাক্ষিণ্যে আমরা সংস্কৃতির একটি নতুন জগতের সন্ধান পেয়েছি এবং 'এই জগৎ-পারাবারের তীরে' আমাদের অজ্ঞাতেই পৃথিবীর সমস্ত মানুষের প্রতি আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে।... সাধারণভাবে একথা বলা যায় যে, সাহিত্যের উপজীব্য হল মানবজীবন, প্রকৃতি ও ভগবান বা অধ্যাত্ম অনুভূতি। রবীন্দ্রসাহিত্যকেও যেমন, রবীন্দ্রসঙ্গীতকেও তেমনি এই তিনটি উপজীব্য বিষয়ের ব্যাপক এবং গভীর ব্যবহার অসামান্যতা দিয়েছে।''[১৫]

রবীন্দ্রনাথের গান যে শুধুমাত্র কথা-সুর-তাল-এর সঙ্গীত আধারে দীপ্ত নয়, লেখকদ্বয়ের সাহিত্য ও সংস্কৃতিবোধের অন্বেষণের মধ্য দিয়ে এই সত্যটি ফুটে উঠেছে।

শান্তিনিকেতনের আরেক অন্যতম আবাসিক, লেখক ও সঙ্গীতশিল্পী দম্পতি কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়-এর যৌথ ভাবনার ফসল 'রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ কাব্য ও সুর' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৫ খ্রিস্টাব্দে। গ্রন্থে উল্লিখিত বিষয়সূচি হল—রবীন্দ্রকাব্য ও রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরবিন্যাস, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ঋতুর

রূপবৈচিত্র্য, রবীন্দ্রনাথের মরমিয়া গান, জনমানস ও রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীতের শ্রোতা, গানের জগৎ ঃ রবীন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ ঃ সঙ্গীতের মুক্তি, রবীন্দ্রনাথের গদ্য গান, আনুষ্ঠানিক রবীন্দ্রসঙ্গীত, সম্মেলক রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রনাথের দেশাত্মবোধক গান, রবীন্দ্রনাটকে নৃত্য ও গীত, ঘটনাভিত্তিক রবীন্দ্রসঙ্গীত, ছোটদের রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সমস্যা, রবীন্দ্রসঙ্গীতে রুচির প্রসঙ্গ, রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিবেশ ও সাম্প্রতিক বাংলা গান, পরিশিষ্ট—উৎসব-বিচিত্রা ঃ শান্তিনিকেতন, দক্ষিণী সুরে রবীন্দ্রসঙ্গীত, শিশুমন ও রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীতে সাম্প্রতিক সমস্যা, শিল্প-সহিষ্ণুতার প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রসঙ্গীতে ঐন্দ্রিয় -চেতনার সামগ্রিকতা, নবযৌবনের রবীন্দ্রসঙ্গীত, সমন্বয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ শিল্পের দায় ও শিল্পীর দায়িত্ব, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সংজ্ঞা এবং রবীন্দ্রসঙ্গীতে বিচ্ছিন্নতাবোধ, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সর্ববেদ্যতা প্রসঙ্গে, সঙ্গীতে সংস্কৃতি, শিক্ষা-সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রনাথের গান, গানে গল্প গল্পে গান।

২৬০ পৃষ্ঠার সংগৃহীত আলোচ্য গ্রন্থটি ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দের পরিমার্জিত ও পরিবর্দ্ধিত সংস্করণ। এই গ্রন্থের ছয়টি প্রবন্ধ লেখকদ্বয়ের পূর্বপ্রকাশিত ১৯৬২ খ্রিস্টাব্দের 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের নানাদিক' গ্রন্থেও পাওয়া যায় যা আমাদের সমীক্ষার প্রথম অধ্যায়ে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে। লেখকদ্বয়ের মুখবন্ধের স্বীকৃতি থেকে জানা যায় যে প্রবন্ধগুলি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন অনুষ্ঠান উপলক্ষে এবং বিভিন্ন পত্রিকার চাহিদায় রচিত বা পঠিত হয়েছে। গ্রন্থ মধ্যে আলোচিত বিষয়গুলির মাধ্যমে লেখকদ্বয় বিষয়ভিত্তিক রবীন্দ্রসঙ্গীত, রবীন্দ্রসঙ্গীতে রুচি ও পরিবেশ, বাংলা ও বাঙালির প্রাত্যহিক জীবনে রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রাসঙ্গিকতা ইত্যাদি দিকের সঙ্গে পাঠকদের পরিচয় করিয়ে দিয়েছেন। রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক বৈচিত্র্যপূর্ণ নানা আলোচনায় সমৃদ্ধ গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুরবিন্যাসে বিশেষ করে ভারতীয় সঙ্গীতের প্রভাবে সুররোপিত রবীন্দ্রসঙ্গীতকে তিন ভাগে বিভক্ত করেছেন। প্রথম যুগের রবীন্দ্রসঙ্গীতে শুদ্ধ উচ্চাঙ্গ

হিন্দী সঙ্গীত, দ্বিতীয় যুগে ক্ল্যাসিক্যাল ভঙ্গির মধ্যে নতুনত্ব আনবার প্রচেষ্টা এবং তৃতীয় যুগে রাগরাগিনীর মিশ্রণ ও লোকসঙ্গীতের মিশ্রণ। রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী সম্বন্ধে লেখকদ্বয় বলেন যে স্বরলিপিতে শুধু সুর, তাল, লয় মানেরই ইঙ্গিত থাকে। তাঁদের মতে গায়ক যদি অন্তরে গানের সুর উপলব্ধি না করেন, গীতরসের সাথে বিশ্বরসের সঙ্গীত উপলব্ধি না করতে পারেন, তবে সে গানের সুর ঠিক হলেও সে সুর উপস্থাপনে খামতি থাকে, আর রবীন্দ্রসাহিত্যরসেও রসিক হতে হবে গায়ককে—তবেই সে গান রবীন্দ্রসঙ্গীত হয়ে উঠবে। লেখকদ্বয় গ্রন্থের 'সঙ্গীতের মুক্তি' বিষয়ক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের গানে ছন্দের মুক্তি প্রসঙ্গে বলেন যে রবীন্দ্রনাথের গীতরচনায় দেখা যায় কবিতা অনেক ক্ষেত্রে প্রচলিত পদ্যছন্দ থেকে আর গান তালবদ্ধতা থেকে মুক্তি পেয়েছে সুরলোকে। ছন্দমুক্তির আলোচনায় লেখকদ্বয়ের মতামত হল যে 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যের বেশ কিছু গান এবং 'চণ্ডালিকা' নৃত্যনাট্যের গানগুলি গদ্যছন্দে রচিত। 'শাপমোচন'-এও গদ্যছন্দের বহুল প্রয়োগ। তাঁরা বলেন যে নাট্যপ্রয়োগে এ ভাবেই সুর ক্রমে তালমাত্রার বন্ধনকে সরিয়ে রেখে ভাবরসের রবীন্দ্রসঙ্গীতের কথার ভাবছন্দে মুক্তি ঘটেছে। লেখকদ্বয় মুক্তছন্দের রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশিষ্টতা লক্ষ্য করে বলতে চেয়েছেন যে, এখানেও ভাবের চিত্ররূপ খাড়া করতে গিয়ে কখনো কবিতার বাঁধন আলগা হয়েছে, কখনো বা সুর দলছুট হয়েছে। আর এই পথ ধরেই ভাবের রাগিনীর মধ্যেই নানাবিধ অচল ঐতিহ্যের আবেষ্টন থেকে মুক্ত হল সঙ্গীত। পদ্যছন্দ ও গদ্যছন্দের তফাৎ নির্ণয়ে লেখকদের ভাবনা হল যে গানের চালটাই যেখানে প্রাধান্য পেল তখন বাণী ও ছন্দমিলের গণ্ডী থেকে বেরিয়ে এলো ভাবের প্রাঙ্গনে, কাব্যছন্দের যখন আর প্রয়োজন রইল না তখন সঙ্গীতের মুক্তি হল রসের জগতে। আর এভাবেই ছন্দ-তাল ইত্যাদি বহিরঙ্গ ছেড়ে গদ্যগানের সৃষ্টি হল মুক্তির নতুনরূপে। রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর দায়িত্ব নিয়ে লেখকদের মতামত হল,

> ‘‘রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর কিছু দায় থাকে, দায়িত্ব থাকে। নিজেকে প্রকাশ করবার চেষ্টায় যেন গানের প্রকাশ আচ্ছন্ন না হয়। ... আত্মবোধ থাকলে যেমন ভগবৎ উপলব্ধি হয় না, তেমনি আত্মনিবেদন না করলে গান শিল্পের শিখর স্তরে পৌঁছায় না। ফলত গীতশিল্পীর সাময়িক প্রশংসা জুটলেও স্থায়ী সাফল্য লাভ হয় না।’’[১৬]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের সামাজিক মূল্য ও প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে লেখকদের ভাবনা হল,

> ‘‘বাংলা গানে অবশ্য বিশেষ করে রবীন্দ্রসঙ্গীতে কথার অংশ সুরের সঙ্গে তুল্যমূল্য... কথাগুলি সুরে ছন্দে লয়ে অঙ্গাঙ্গী সংহত রূপ নিয়ে ‘গান’ হয়ে ওঠে পরিপূর্ণ সঙ্গীত, নিটোল গান। যে গানের ভিতর দিয়ে ভুবনখানি দেখা যায়, চেনা যায়, জানা যায়। রবীন্দ্রসঙ্গীত এই সংহত রূপ নিয়ে আমাদের মনকে সংযত সমাহিত করে তোলে। বাণী সুর ছন্দ লয়—সব এসে একের মধ্যে বিলীন হয়। ... রবীন্দ্রসঙ্গীত জীবনবীণা ও জীবনবাণীতে সমতা এনে দেয়। এজন্যই রবীন্দ্রসঙ্গীত শিক্ষা আবশ্যক ও গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে হয়।’’[১৭]

লেখকদ্বয় তাঁদের জীবনের অভিজ্ঞতায় রবীন্দ্রমননকে আত্মস্থ করে বিচিত্রধর্মী রচনার আলোকে রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল্যায়ন করেছেন এই গ্রন্থে। রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনার সরণীতে গ্রন্থটি রবীন্দ্রসঙ্গীত পিপাসুদের তৃপ্ত করে।

।। পাঁচ।।

কিরণশশী দে-র 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রামান্য সুর' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৬ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। সংগৃহীত আলোচ্য গ্রন্থটি তৃতীয় সংস্করণ, প্রকাশিত হয় ২০০০ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। গ্রন্থের বিষয় সূচিতে রয়েছে— অবতরণিকা, লেখকের নিবেদন, প্রকাশকের বক্তব্য। প্রস্তাবনা—ভাষালিপি স্বরলিপি, সঙ্গীতলিখন প্রণালী প্রসঙ্গে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর-সংরক্ষণীয় বিধিব্যবস্থা, স্বরলিপি নিয়ে বিশৃঙ্খলার সূত্রপাত, স্বরলিপি পরিবর্তন সম্পর্কীয় অভিযোগ-অরণ্যে রোদন, স্বরলিপি করে রাখার সার্থকতা কিসে-যদি তা পুনঃ পুনঃ পরিবর্তিত হতে থাকে—বিনা কৈফিয়তে? ধারা বিবরণী—১৩৪৭ সালের ঘটনা, ১৩৭৫ সালের ঘটনা, ১৩৭৬ সালের ঘটনা, স্বরবিতানে 'সুরভেদ-ছন্দোভেদ' শীর্ষক বিজ্ঞপ্তি কেন? ১৩৭৭ সালের ঘটনা, স্বরলিপির মাধ্যমে গায়কীরও সন্ধান পাওয়া যায়। উপসংহার—রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রামান্য সুর কোনটি, 'যুগান্তর' ও 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় প্রকাশিত প্রশ্নগুলির উদ্ধৃতি। নতুন সংযোজন—আরো কিছু তথ্য ।। কিছু জিজ্ঞাসা, গায়ক-অগায়ক সকলে মিলে আলোচনা করুন, সঙ্গীত অনুশীলনকারীদের মধ্যে, স্বরলিপি গ্রন্থে প্রামান্য সুর বর্জনের প্রথম সূত্রপাত, সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে বিনীত ব্যাখ্যান, গানের কথার অক্ষর/গানের সুরের অক্ষর, প্রসঙ্গ ঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি বিভ্রাট, 'সমতট প্রকাশনে'র সেমিনার/প্রসঙ্গ ঃ রবীন্দ্রসঙ্গীত স্বরলিপি সমস্যা, স্বরলিপি সম্পাদনা রীতি, রবীন্দ্রসঙ্গীত-স্বরলিপি সমস্যা সমাধানের প্রস্তাব, রবীন্দ্রসৃষ্টির প্রতি আমাদের অন্তরের ভক্তিশ্রদ্ধা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপি পরিবর্তন প্রসঙ্গে। পরিশিষ্ট।

আলোচ্য গ্রন্থের দীর্ঘসূচি থেকে তার গাঢ় দাগে লেখা শিরোনামগুলিই

তুলে ধরেছি প্রস্তাবনা, ধারা বিবরণী, উপসংহার, নতুন সংযোজন এই মূল চারটি অধ্যায় থেকে। গ্রন্থের অবতরণিকা লিখেছেন সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি বিকৃতি নিয়ে ভূমিকা লেখক তাঁর গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথের গান'-এ পূর্বেই আলোচনা করেছেন। কিরণশশী দের রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর, স্বরলিপি নিয়ে নানা ভাবনা এই গ্রন্থ রচনার পূর্বেই প্রবন্ধ আকারে নানা পত্রপত্রিকায় স্থান পেয়েছে। লেখকের মতে বর্তমান গ্রন্থে বর্ণিত বিষয়গুলি তার পূর্বের রচনা 'রবীন্দ্রসঙ্গীত-স্বরলিপি-জিজ্ঞাসা' গ্রন্থের পরিণততররূপ। বহুদিন ধরে স্বরলিপি বিষয়ে পুঞ্জীভূত প্রশ্ন, সংশয় ও ভাবনাকে একসাথে উপস্থাপিত করেছেন এখানে। গ্রন্থটিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিশেষজ্ঞ, শিল্পীদের স্বরলিপি বিষয়ে নানা মতামতও লেখক তুলে ধরেছেন। লেখক ' প্রামাণ্যসুর' বলতে রবীন্দ্রনাথের গানের সর্ব প্রথম স্বরলিপি অর্থাৎ প্রথম যে সুরগুলি স্বরবিতানে সংকলিত হয়ে সর্বসমক্ষে প্রকাশিত হয়েছিল, তাকেই বুঝিয়েছেন। শান্তিনিকেতনের প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় শিক্ষিত রবীন্দ্রসঙ্গীতের একনিষ্ঠ সাধক, রবীন্দ্রস্নেহধন্য কিরণশশী দে আলোচ্য গ্রন্থে কোন্ সালে কোন্ কোন্ গানের স্বরলিপি পরিবর্তিত হয়েছে সে সম্বন্ধে তৎকালীন সময়ে বিভিন্ন রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ এবং স্বরলিপি প্রকাশনার সঙ্গে যুক্তদের অভিমত ইত্যাদি নানা তথ্যের উল্লেখের মাধ্যমে রবীন্দ্রসঙ্গীত জিজ্ঞাসুদের সামনে স্বরবিতানের নানা ত্রুটি-বিচ্যুতি সম্বন্ধে অজানা অসংখ্য তথ্য তুলে ধরেছেন, যা এক কথায় অমূল্য। এই গ্রন্থে রবীন্দ্রগানের ভাণ্ডারী দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর সম্বন্ধে লেখক বলেছেন,

> ''রবীন্দ্রনাথের অধিকাংশ গানের স্বরলিপিকার ছিলেন দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর। ... দিনেন্দ্রনাথের জীবিতকালের মধ্যে তাঁর কৃত সমস্ত স্বরলিপিগুলি ঠিক গ্রন্থাকাররূপে প্রকাশ পেতে পারেনি... বহু বিশেষজ্ঞেরই অভিমত যে,

রবীন্দ্রনাথের সব রকম গানের যথার্থ এবং সম্পূর্ণ ভাবব্যঞ্জক স্বরলিপিকার হিসাবে সঙ্গীতাচার্য দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর ছিলেন অতুলনীয়।"[১৮]

লেখক তাঁর বক্তব্যের অবতারনায় 'সুরছন্দা' পত্রিকায় এপ্রিল ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত ডাঃ বিমল রায়ের বক্তব্য তুলে ধরেন। ডাঃ রায় এর বক্তব্যে রয়েছে,

"দিনেন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রনাথের তিরোধাণের পর বিশ্বভারতী নতুন গানের স্বরলিপির সহিত আগের পুরাতন গানগুলিও প্রকাশ করিতেছেন; কিন্তু লক্ষ করিয়া দেখিতেছি যে, সেগুলির মধ্যে পাঠান্তর, স্বরান্তর, সুরান্তর ও সংস্কার আনিবার যেন একটা ইচ্ছাকৃত প্রয়াস মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছে—তালেরও নানা গতি লাভ হইতেছে। এই প্রয়াস নাকি কবি প্রতিভার নানা-মুখীনতার প্রতি ভক্তি অর্ঘ্য!"[১৯]

ডাঃ বিমল রায় সহ নানা গুণী ও রবীন্দ্রভক্তদের এ ধরনের বক্তব্যের সঙ্গে লেখক আরও কয়েকজন রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ তথা শিল্পীদের বক্তব্যেরও অবতারনা করেন। যেমন কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'রবীন্দ্রসঙ্গীতের ভূমিকা' গ্রন্থে রয়েছে—

"বিশ্বভারতী-স্বরলিপি সমিতি 'স্বরবিতান' মারফৎ সুরের যে সর্বজনীন রূপ দেবার চেষ্টা করছেন তাতে অনেক ফাঁক বা অসঙ্গতি থেকে যাচ্ছে। সে রকম না করে একটি প্রামাণিক সুরের সঙ্গে সঙ্গে প্রচলিত সুর-ভেদের এবং সব কয়টি সুরেরই স্বরলিপি প্রচার করা উচিত।"[২০]

এই গ্রন্থে সংযোজিত সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আনন্দবাজার পত্রিকায় বৈশাখ ১৩৭৬ সালে প্রকাশিত বক্তব্যে রয়েছে—

> ‘‘কাঙ্গালীচরণ সেন, সুরেন্দ্রনাথ ও দিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর কৃত স্বরলিপিগুলিকে প্রামাণ্য স্বরলিপি হিসাবে আমাদের গণ্য করতে হবে। অবশ্য দিনেন্দ্রনাথ কৃত স্বরলিপির ক্ষেত্রে দিনেন্দ্রনাথের জীবিত অবস্থায় রবীন্দ্রনাথের যে স্বরলিপি গ্রন্থগুলি বের হয়েছিল, সেই প্রথম সংস্করণগুলিকেই প্রামাণ্য বলে গ্রহণ করা হবে। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর স্বরলিপি গ্রন্থগুলিতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সুর বদল করা হয়েছে বারবার।’’[২১]

লেখক স্বরলিপি বিষয়ে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় তাঁর প্রকাশিত মন্তব্যে বলেছেন—

> ‘‘...রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপিগুলি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং দেখে শুনে অনুমোদন করে ছাপিয়ে গেছেন। তা সত্ত্বেও প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁর মৃত্যুর পরে ঐ ছাপানো স্বরলিপিগুলির উপর অনেকক্ষেত্রে পরিবর্তন পরিমার্জন ঘটিয়ে তার বিকৃতি সাধন করা হয়েছে, অথচ এ কাজের জন্যে আজ পর্যন্ত কোনো কৈফিয়ৎ দেওয়া হয়নি।’’[২২]

লেখকের মতামত হল যে সব সময় রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রামাণ্য স্বরলিপিটিই সংগ্রহ করে গান শিখতে হবে। লেখকের গবেষণায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্বরলিপির বিকৃতি বিষয়টি মনে রেখেও আমাদের বলতে ইচ্ছা করে রবীন্দ্রসঙ্গীত শুধু স্বরলিপি থেকে গলায় তুলে নিলেই কাজ ফুরিয়ে যায় না। যথার্থ গুরু-শিষ্য পরম্পরাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের

সার্থক রূপায়নে সাহায্য করে। সমস্ত বাদ বিবাদ, গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের ঊর্ধে আজকের দিনে বিশেষ করে রবীন্দ্রনাথের গানের সুরের যে উপস্থাপনা দেখা যায়, তাতে অনেক সময় সঠিক স্বরলিপিতে গাইলেও যথার্থ গায়কীর অভাবে রবীন্দ্রসঙ্গীতকে চেনা দায় হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় প্রামাণ্য স্বরলিপি বা স্বরবিতানের নানা সংস্করণের স্বরলিপি, গানের সুরান্তর সবকিছুকে সাঙ্গীকৃত করে যথার্থ গুরুর আশ্রয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত শিখতে হবে, চর্চা করতে হবে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রামান্য স্বরলিপির জন্য লেখক সচেষ্ট হয়েছিলেন, এখন দিন এসেছে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সার্বিক প্রামানিকতা রক্ষার জন্য সচেষ্ট হওয়া, যাতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের সৌরভ হারিয়ে না যায়।

।। ছয়।।

রবীন্দ্র তত্ত্বাচার্য অধ্যাপক অরুণকুমার বসু-র 'বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে। আলোচ্য গ্রন্থটি ডিসেম্বর ২০১০ খ্রিস্টাব্দের পরিমার্জিত সংস্করণ। দুটি পর্বে বিভক্ত এই গ্রন্থের প্রথম পর্বে রয়েছে বাংলা কাব্যসঙ্গীত উৎস ও বিবর্তন প্রথম থেকে সপ্তম অধ্যায়, আর দ্বিতীয় পর্বটি হল রবীন্দ্রসঙ্গীত, (অষ্টম থেকে অষ্টাদশ অধ্যায়)। আমাদের আলোচ্য বিষয় দ্বিতীয় পর্বের রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক এগারোটি অধ্যায় । রবীন্দ্রসঙ্গীত পর্বের সূচিপত্রটি হল—অষ্টম অধ্যায় ঃ রবীন্দ্রনাথের সঙ্গীতচিন্তা, নবম অধ্যায় ঃ রবীন্দ্রসঙ্গীতের 'পর্যায়' ঃ প্রচার ও বিচার, দশম অধ্যায় ঃ কবিতা ও গান ঃ 'দেওয়া নেওয়া ফিরিয়ে দেওয়া', একাদশ অধ্যায় ঃ নাট্যগীতি, দ্বাদশ অধ্যায় ঃ ঋতু ও প্রকৃতির গান, এয়োদশ অধ্যায় ঃ প্রেম পর্যায় ঃ 'ভালোবাসার অমৃত', চতুর্দশ অধ্যায় ঃ পূজা পর্যায় ঃ 'যারে বলে ভালোবাসা তারে বলে পূজা', পঞ্চদশ অধ্যায় ঃ

স্বদেশ পর্যায় জ্ঞ 'তোমাতে বিশ্বময়ীর তোমাতে বিশ্বমায়ের আঁচল পাতা', ষোড়শ অধ্যায় জ্ঞ বাউল প্রভাব জ্ঞ 'গুঞ্জরিল একতারা যে', সপ্তদশ অধ্যায় জ্ঞ নৃত্যনাট্য ও গদ্যগান জ্ঞ 'খেলা ভাঙার খেলা', অষ্টাদশ অধ্যায় ঃ কাব্যসঙ্গীতের স্বর্ণশিখর। নির্ঘষ্ট।

রবীন্দ্রসঙ্গীতের বহুমাত্রিক দিক নিয়ে বিভাজিত অধ্যায়গুলিতে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি সম্পন্ন, মনন ঋদ্ধ আলোচনা ও বিশ্লেষণের মধ্যে কাব্যসঙ্গীতের ভাব ও চরিত্র নিরূপণ করে লেখক রবীন্দ্রনাথকে বাংলার সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্যসঙ্গীতকার রূপে প্রতিপন্ন করেছেন। গীতি প্রবণতা রবীন্দ্রনাথের কবিধর্মের মর্মমূলে নিহিত ছিল বলেই বিভিন্ন গীতি কবিদের পথ বেয়ে বাংলার সঙ্গীতবহুল গীতি কাব্যধারা যে রবীন্দ্রনাথেই পূর্নাঙ্গ সিদ্ধিলাভ করেছে, গ্রন্থ মধ্যে আলোচিত নানা পর্যায় বা ধারার রবীন্দ্রগানে বরেণ্য সমালোচক তা-ই দেখিয়েছেন।

রবীন্দ্রনাথের ঋতু ও প্রকৃতির গান সম্বন্ধে লেখকের অনুভব হল প্রকৃতির মধ্যে সবসময় চলেছে যে বন্ধন ও মুক্তির লীলা, রবীন্দ্রনাথের প্রকৃতি পর্যায়ের গানে তারই প্রকাশ ঘটেছে। প্রেম পর্যায়ের গান সম্বন্ধে লেখকের অনুভব হল বেদনা থেকে উৎসারিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রেমসঙ্গীত। বিচ্ছেদ বিরহের দ্বারাই কবির প্রেম প্রদীপ্ত। আর গান দিয়েই এই বিরহকে কবি যেন স্পর্শ করেছেন। রবীন্দ্রনাথের প্রেমের গানের পটভূমিতে রয়েছে নিসর্গ প্রকৃতির সঙ্গ ও অনুষঙ্গ, এও লেখকের নিরীক্ষায় ধরা পড়েছে। পূজা পর্যায় নিয়ে তাঁর মতামত হল, ব্রাহ্ম সমাজের গানের যে শুষ্ক বৈরাগ্য বা জীবনবিমুখতা সাধারণত দেখা যায় তার বিপরীতে রবীন্দ্রনাথের পূজার গান জীবনমুখী, মমতা আর আনন্দে ভরপুর। আলোচক রবীন্দ্রনাথের পূজার গানকে 'ব্রহ্মসঙ্গীত' এবং 'রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব ধর্মবোধ ও ভক্তিপ্রেরণা থেকে উৎসারিত পূজার গান' এই দুই ভাগে বিভক্ত করেছেন। স্বদেশ পর্যায় সম্পর্কে আলোচনায় তিনি বলেছেন যে, রবীন্দ্রনাথ

মৃত্তিকাময়ী দেশমাতৃকাকে বিশুদ্ধ সমাজচেতনার সঙ্গে গ্রহণ করেননি, বিশ্বচেতনার অঙ্গরূপেই স্বদেশ সত্তা কবির কাছে সত্য হয়ে দেখা দিয়েছিল। তাঁর মতে ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দ অর্থাৎ বঙ্গভঙ্গ বিরোধী আন্দোলনের পর্বকালই রবীন্দ্রনাথের স্বদেশী সঙ্গীত রচনার শ্রেষ্ঠকাল। রবীন্দ্রনাথের স্বদেশ চেতনার মূলে ধর্মবোধ, মনুষ্যত্ব এবং ঈশ্বরচেতনার পারস্পরিকতা ছিল বলেই লেখক বিশ্বাস করেন। রবীন্দ্রনাথের গানে বাউল প্রভাব নিয়ে লেখকের মতামত হল যে তথাকথিক বাউল সুরকে সবসময় সরাসরি গ্রহণ করেননি রবীন্দ্রনাথ, বাউল ভাব আর সুরকে রবীন্দ্রব্যক্তিত্বে বিগলিত করে তবেই গ্রহণ করেছেন। লেখকের তীক্ষ্ণ পর্যবেক্ষণে ধরা পড়েছে, প্রথম জীবনে পূর্ববঙ্গের কিছু বাউল পদবাচ্য সুর কবিকে অনুপ্রাণিত করেছিল, যার সাথে মিশেছিল কীর্তনের ধারাও, কিন্তু উত্তরজীবনে এসব সুরে মিশে গেছে রাগরাগিনীর সুরের চাল, যা একটি স্বতন্ত্র বাউলধারার গানে পর্যবসিত হয়ে কবিকে 'রবিবাউল' এর যথার্থ আখ্যা দিয়েছে।

নাট্যগীতি'র আলোচনায় তিনি বলেছেন যে 'বাল্মীকি প্রতিভা' নাট্যসৃষ্টি সঙ্গীত রচনার ইতিহাসে রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের সবচেয়ে বিশিষ্ট রচনা, যার ভিতর সুস্পষ্টভাবে পরবর্তী প্রবণতার বীজগুলি অনুধাবন করা যায়। নানা নাটকে গানের প্রয়োগের সুসংহত আলোচনার মধ্য দিয়ে এগোতে এগোতে রবীন্দ্রনাথের শেষজীবনের নৃত্যনাট্য রচনায়ও লেখক 'বাল্মীকি প্রতিভা'র আঙ্গিক খুঁজে পান। তবে শ্রদ্ধেয় গবেষকের মতে, 'নটীর পূজা'ই রবীন্দ্রনাথের নৃত্যনাট্যের পূর্বাভাস। 'শাপমোচনে' সংলাপ এর সমান্তরালে রয়েছে সঙ্গীত এর অবস্থান লেখকের অনুসন্ধানে তা ধরা দেয়। তাঁর মতে রবীন্দ্র কাব্যসঙ্গীতে ছন্দের বন্ধন ভাঙার চেষ্টা সম্ভবত নৃত্যনাট্যেই বেশি দেখা যায়। রবীন্দ্রনাথের গদ্যছন্দ রচনা আর নৃত্যনাট্য রচনার কাল সমসাময়িক বলেই তিনি মনে করেন। অধ্যাপক অরুণকুমার বসু

বলেন,

> ''নৃত্যনাট্যের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের কাব্যছন্দে গদ্যধর্মিতার প্রয়োগ ঘটল এবং শেষ জীবনের অধিকাংশ গানেই কবি গানের আঙ্গিকে ছন্দকে অপরিহার্য করে তুললেন না। ... অসামান্য প্রতিভার স্পর্শেই 'গদ্যে রঙ ধরেছে পদ্যের'। তাঁর ভাষার আশ্চর্য ধ্বনিবহ ক্ষমতা, অলংকার চিত্রকল্পের অভাবনীয় দ্যুতি, উপলব্ধির অনন্যতা এই সব গদ্যের উপর এনে দিয়েছে দুর্লভ কাব্যগুণের প্রতীয়মান ধর্মগুলিকে, শেষ পর্যন্ত সুরের ছোঁওয়ায় তারা উধাও হয়েছে নিঃসীম শূণ্যে ছন্দের অভাব দুঃখের চিহ্ন বলে মনে রাখতে দেয়নি।''[২৩]

'কবিতা ও গান' অধ্যায়ে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিশেষজ্ঞ দেখিয়েছেন, 'ছবি ও গান' কাব্যগ্রন্থের 'কে' শিরোনাম 'আমার প্রাণের পরে চলে গেল কে' কবিতাটি গানে রূপান্তরিত হওয়ার পর থেকে 'কড়ি ও কোমল' থেকে কবির শেষজীবন পর্যন্ত কবিতার গানে আর গানের কবিতায় রূপান্তরের ধারা। এই প্রসঙ্গে অধ্যাপক অরুণকুমার বসুর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য,

> ''গানের সুর চিরকালই কবির কাছে স্মৃতিগন্ধবহ। গানের সুর এই চেনা জগতের উপর অচেনার আবরণ বিছিয়ে দেয়, গানের সুর বর্তমান থেকে কবিকে এক কালচিহ্নহীনলোকে নিয়ে যায়।''[২৪]

লেখকের গবেষণায় 'কল্পনা' কাব্যগ্রন্থের মধ্যে কবিতা অর্থাৎ সুরহীন গীতিকবিতা এবং সুরাশ্রিত কবিতা অধিক সংখ্যায় অবস্থান করেছে, 'নৈবেদ্য'

থেকে ‘গীতালি’ কাব্যগ্রন্থের ধারায় সঙ্গীত আর কবিতায় যেন গলাগলি ভাব যেখানে পৃথকভাবে গান আর কবিতা বোঝা শক্ত। অধ্যাপক বসু মনে করেন, ‘গীতাঞ্জলি’, ‘গীতিমাল্য’ ও ‘গীতালি’ তিনটি কাব্যগ্রন্থের রূপরীতি এবং নামাকরণের সাদৃশ্য আছে। তিনটি কাব্যেই কবির গানের ভিতর দিয়ে জগতদর্শন, সঙ্গীতের সূক্ষ্মতা পরিব্যাপ্ত। এই অধ্যায়ে লেখকের ভাবনায় যথার্থভাবে ফুটে উঠেছে সুরহীন কবিতা ও সুরাশ্রিত গান যে ‘একই পল্লবের যুগ্ম কিশলয়’। সর্বজন শ্রদ্ধেয় রবীন্দ্র বিশেষজ্ঞ অধ্যাপক বসু তাই বলেন,

> ‘‘গানে গানে কবির বন্ধন ঘুচে গেছে, গানের ভেলায় পূর্ণ হয়েছে প্রাণের আশা-আকাঙ্ক্ষা। ঋতুর বর্ণালিম্পনে গানের জোয়ার এসেছে ক্ষণে ক্ষণে, পুরাতন দিনের স্মৃতিভার সুরের মায়াজাল বিস্তার করেছে। আসা যাওয়ার পথের ধারে গান গাইবার আর বিরাম ছিল না কবির। সেইসঙ্গে তাঁর কাব্যধারাও চলছে সমান্তরাল বেগে, নানারূপে, ঋতুবদলে, লগ্নবদল পালাবদলের ছাড়পত্রে।’’[২৫]

খ্যাতনামা রবীন্দ্র-গবেষক, অধ্যাপক, গীতিকার, সাহিত্যিক অরুণকুমার বসু রবীন্দ্রনাথের কবিত্ব আর বিভিন্ন ধরনের গানে কাব্যের গুরুত্ব বিষয়ে বিস্তৃত, তাত্ত্বিক ও তথ্যবহুল গভীর তাৎপর্যপূর্ণ বিশ্লেষণ করেছেন এই গ্রন্থে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের যে বহুমাত্রিক আলোচনা তিনি করেছেন, তা সুরের দিক থেকে নয়, কাব্য প্রতিভার দিক থেকেই করেছেন। এই গবেষণা গ্রন্থটি সম্ভবত বাংলা কাব্যসঙ্গীতের ইতিহাসে সর্ববৃহৎ তথ্য ও তত্ত্বে ভরপুর সর্বোৎকৃষ্ট কোষ গ্রন্থ।

প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের ৪৩ পৃষ্ঠায় ‘গীতবিতান কালানুক্রমিক সূচি’ (২য় খণ্ড) প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৮ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে। গ্রন্থটি পর্যবেক্ষণে দেখা

যায় মোট ৮৭১টি গানের তালিকা রবীন্দ্রনাথের বয়সের কালানুযায়ী সংযোজিত হয়েছে। 'চণ্ডালিকা', 'শ্যামা' প্রভৃতি নৃত্যনাট্যের গানগুলিও স্থান পেয়েছে। পরিশিষ্ট অংশে প্রথমখণ্ডের ১৭টি গান সংযোজিত হয়েছে যেগুলি ভুলবশত প্রথম খণ্ডে স্থান পায়নি। বর্তমানে সংগৃহীত আলোচ্য গ্রন্থের অখণ্ড সংস্করণ, যা ডিসেম্বর ২০০৩ সালে প্রকাশিত হয়েছে, তাতে রবীন্দ্রনাথের কালানুযায়ী গানের রচনায় সর্বমোট গানের সংখ্যা হল ২১৭৫টি। এই গ্রন্থটি রবীন্দ্রসঙ্গীত চর্চায় গীতবিতানের পাশাপাশি সমাদৃত। রবীন্দ্রসঙ্গীতের বিষয়গত দিক দিয়ে কালানুসারে রূপান্তরের বা পরিবর্তনের ইতিহাস সন্ধানেও এই সূচি গ্রন্থ বিশেষ ভাবে সহায়কসূত্র হিসাবে কাজ করবে। এ ধরনের গবেষণালব্ধ গ্রন্থের সংখ্যা নেহাতই অপ্রতুল।

।। সাত।।

সাহানা দেবীর 'স্মৃতির খেয়া' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৭৯ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। আলোচ্য গ্রন্থটির তৃতীয় মুদ্রণ প্রকাশিত হয় ১৯৯২ খ্রিস্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে। গ্রন্থটির পর্যবেক্ষণেই গ্রন্থের নামাকরণের সার্থকতা খুঁজে পাওয়া যায় সাহানা দেবীর জীবনরূপ খেয়ার স্মৃতিবিজড়িত নানা ঘটনাবলীর মধ্যে। গ্রন্থে সমালোচকের লেখনীতে ধরা পড়ে রবীন্দ্রনাথের গানের মাধ্যমে তাঁর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্কের কথা, রবীন্দ্রসান্নিধ্যে শিল্পী ও প্রাবন্ধিকের গান শেখা আর কবির প্রশংসা অর্জনের কথা। এছাড়া রবীন্দ্রনাথের গান রচনা, তাঁর গাওয়া গানের প্রতি কবির আস্থা, রবীন্দ্রসঙ্গীতের গায়কী, রবীন্দ্রসঙ্গীতের সামাজিক মূল্য, স্বরলিপির কথা ইত্যাদি নানা বিষয় তাঁর কথায় ধরা দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ সাহানা দেবীর গান শুনে আস্থা প্রকাশ করেছিলেন, যা কবির কথায় 'সঙ্গীতচিন্তা'তেও রয়েছে। কবি

বলেছিলেন যে তাঁর গানের মূল সুরটি ধরতে পেরেছেন 'ঝুনু', মানে সাহানা দেবী। এসব প্রসঙ্গের অবতারণায় কবির কাছে গান শেখার অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি বলেছেন,

> ''কি যত্ন আর ভালবাসা নিয়ে যে তিনি গান শেখাতেন। এক এক সময় একসঙ্গে বসে কত গানই যে আমি শিখেছি। গান শেখার শুরু করতেন যে উৎসাহ নিয়ে সেই একই রকম উৎসাহে দেখেছি তিনি গান শেখানো শেষ করতেন। গান জিনিষটি যে তাঁর কত প্রিয় ছিল, গান শুনতে যত ভালবাসতেন শেখাতেও ততই ভালবাসতেন। দুটোতেই দেখেছি সমানই দরদ, সমানই আনন্দ পেতেন। নিজে গাইতেও ভালবাসতেন।''[২৬]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূলধারা নিয়ে তিনি বলেছেন যে,

> ''রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল ধারা কি তা এক কথায় বলা কঠিন। তবুও বলা চলে, তাঁর কথা, সুর ও ভাব এমনভাবে পরস্পরে আশ্রিত, এমন নিবিড়ভাবে এক হয়ে মিশে থাকে যে কোনটাই কোনটাকে ছাপিয়ে ওঠে না বা একটা থেকে আর একটা প্রবল বা প্রধান হয়ে ওঠে না। ... এই মিলনের দ্বারা যে পূর্ণতা ঘটে, যে স্পর্শ ফুটে ওঠে তাই হচ্ছে রবীন্দ্রনাথের রচিত গান, রবীন্দ্রসঙ্গীত বলে যা আমরা জানি।''[২৭]

রবীন্দ্রসঙ্গীতে স্বরলিপির গুরুত্ব নিয়ে তাঁর বক্তব্য হল,

> ''স্বরলিপি দেখে গান তোলা শিক্ষার দিক দিয়ে আবশ্যক। সঙ্গীত শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না স্বরলিপি না জানলে। ... গায়কের

মনে রাখতে হবে যে স্বরলিপি কখনও ষোল আনা দিতে পারে না। ... গায়ককে দিতে হয় অনেকখানি যা স্বরলিপিতে পাওয়া যায় না তার সবটাই। ... স্বরলিপি দিতে পারে সুরটা কিন্তু দিতে পারে না সুরের অতীত সেই সোনার কাঠির স্পর্শ যাতে গান হয়ে ওঠে গান আর যথার্থরূপে ফুটে ওঠে তার সত্তা। স্বরলিপির প্রয়োজন আছে অনাগত কালের জন্যে আর ভুলে যাওয়া সুরকে ধরিয়ে দিতে পারে এই হল তার প্রধান কাজ।"[২৮]

রবীন্দ্রসঙ্গীতের উপস্থাপন নিয়ে লেখিকা তাঁর যুগের সাথে তুলনা করতে গিয়ে লিখেছেন,

"রবীন্দ্রসঙ্গীত আমাদের দিনে যা ছিল, এখন তা নেই, তা থাকার কথাও নয়। যুগ যুগ ধরে কোনো জিনিসই একইরকম থাকে না, বদলে যায়ই। ... আজ রবীন্দ্রসঙ্গীত প্রাণহীন।"[২৯]

রবীন্দ্রস্নেহধন্যা ও সর্বজন শ্রদ্ধেয়া সাহানাদেবী তাঁর হৃদয়স্পর্শী লেখনীতে যা তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা গবেষণা ও সমীক্ষায় তা তাঁর পরবর্তীকালের গবেষক, আলোচক ও রবীন্দ্রসঙ্গীত পিপাসু যে কোনও ব্যক্তিকে সঠিক পথের দিশা দেখাতে সক্ষম হচ্ছে এবং হবে, সন্দেহ নেই।

।। আট।।

শঙ্খ ঘোষ-এর 'এ আমির আবরণ' গ্রন্থ প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে। ১৪৯ পৃষ্ঠার সংগৃহীত আলোচ্য গ্রন্থটি পঞ্চম মুদ্রণ প্রকাশিত হয়

২০০২ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর মাসে। গ্রন্থমধ্যে অন্তর্ভুক্ত প্রবন্ধগুলি হল—'মর্ত্য কাছে স্বর্গ যা চায়', 'নিভৃত প্রাণের দেবতা', 'অতল কালো স্নেহ', 'আপন হতে বাহির হয়ে', 'এ আমির আবরণ', 'একটি রক্তিম মরীচিকা', 'বেদনা কী ভাষায়', 'ধরেছি ছন্দোবন্ধনে', 'এর পূরবী ওর বিভাস', 'গানের ভিতর দিয়ে যখন'।

গ্রন্থের ভূমিকায় লেখকের মন্তব্য থেকে জানা যায় যে সংকলিত প্রবন্ধগুলির বেশ কয়েকটি ঢাকার 'ছায়ানট', কলকাতার 'রবিরঞ্জনী' আর 'ইন্দিরা'র অনুরোধে লেখা। লেখকের অনুসন্ধানী লেখনীতে বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে 'গীতাঞ্জলি', 'গীতিমাল্য ও 'গীতলি'র গানগুলির মধ্যে রবীন্দ্রমনের এক প্রচ্ছন্ন ইতিহাস। এখানে উপস্থাপিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের পূজা প্রেম প্রকৃতি পর্যায়ের গানের বিশ্লেষণ। 'গীতাঞ্জলি গীতিমাল্য গীতালি'তে কবিমনের তিনটি স্তর ধরা দিয়েছে লেখকের ভাবনায়—

> ''দৈনন্দিনতার যে তুচ্ছ আমি ব্যক্তিসীমায় বেঁধে রাখে আমাকে, আমার ভিতরকার তুমির বোধে পৌঁছে খসে পড়ে যেটা, সেই আমির হাত থেকে মুক্তির পাবার আকাঙ্খাই অনেক বড়ো জায়গা নেয় 'গীতাঞ্জলি'তে, 'গীতিমাল্য'তে আছে এই মুক্তির জন্য অন্তর্গূঢ় আয়োজন, আর 'গীতালি'তে এসে মনে হয় সেই আয়োজন যেন পূর্ণ হয়ে এল, যেন এবার আমি মিলল এসে তুমির মধ্যে।''[৩০]

লেখকের ভাবনায় পূজা ও প্রেম পর্যায়ের 'গানের গান' উপশ্রেণির গানগুলির মধ্যে রয়েছে সেতুবন্ধন, পূজা ও প্রেম একজায়গায় মিলে তৈরি করে তৃতীয় আরেকটি পর্যায়, যাকে বলা যায় ভালবাসার গান। এই গ্রন্থে রয়েছে 'সানাই' কাব্যের বেশ কয়েকটি কবিতার গানে রূপান্তরের ইতিহাস, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের গানগুলিকে

শেষ জীবনের গানে ছুঁয়ে থাকার কথা, আবার গীতিকবি রবীন্দ্রনাথ ও নাট্যকার রবীন্দ্রনাথের আপাতবিরোধে গীতিকবি রবীন্দ্রনাথের শ্রেষ্ঠত্বের প্রমাণ দিয়েছেন লেখক তাঁর প্রবন্ধে। খ্যাতনামা কবি, বিশিষ্ট প্রাবন্ধিক, অধ্যাপক ও গবেষক শ্রীশঙ্খ ঘোষ এর মতো বিদগ্ধ জনের লেখনীতে রবীন্দ্রসঙ্গীতের জিজ্ঞাসুরা পেয়ে যান রবীন্দ্রনাথের গানের কথার মধ্যে রবীন্দ্রমনের প্রচ্ছন্ন এক ইতিহাস, যেখানে রয়েছে গীতবিতানের গানের পাশাপাশি রবীন্দ্রনাটক ও উপন্যাসের গানের কালগত এক পরম্পরা। রবীন্দ্রসঙ্গীত যে শুধুমাত্র সঙ্গীত নয়, এর কথার মধ্যে রয়েছে উচ্চমার্গের সাহিত্য ভাবনা তা-ই শ্রী শঙ্খ ঘোষের ভাবনায় প্রতিপন্ন হয়েছে।

বিখ্যাত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী পঙ্কজ কুমার মল্লিক-এর 'আমার যুগ আমার গান' গ্রন্থটি প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৮০ খ্রিস্টাব্দে। সংগৃহীত ২৩৭ পৃষ্ঠার আলোচ্য গ্রন্থটি ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত পুনর্মুদ্রণ। গ্রন্থটির অনুলেখন অরুণাভ সেনগুপ্তের। পঙ্কজ মল্লিকের সুদীর্ঘ ষাট বৎসরের বর্ণময় সঙ্গীতজীবনের কথা গ্রন্থের প্রতিটি পর্বে বর্ণিত হয়েছে। বিশেষ করে তাঁর সঙ্গীত জীবনে রবীন্দ্রনাথের গানের ভুবনের অনেক অকথিত অজানা তথ্যে সমৃদ্ধ এই গ্রন্থ। রবীন্দ্রনাথের গানকে শান্তিনিকেতন বা অন্যান্য প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বাইরে শ্রীমল্লিক কীভাবে বেতার, গ্রামাফোন, সিনেমা ও দূরদর্শনের মাধ্যমে বাঙালি তথা ভারতের জনসাধারণের মধ্যে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন তাঁর পৌরুষদীপ্ত কণ্ঠস্বর ও গায়নশৈলীর মধ্য দিয়ে এ সবেরই সাক্ষ্য বহন করছে এই গ্রন্থ। দিনেন্দ্রনাথের শিক্ষায় শিক্ষিত ও দীক্ষিত শিল্পী পঙ্কজ মল্লিক যে উত্তরকালের রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী-গায়কদের গায়নরীতির পথ প্রদর্শক এর উল্লেখ পাওয়া যায় বেশ কিছু বিশিষ্ট শিল্পী ও কবিপুত্র রথীন্দ্রনাথের মন্তব্যের মাধ্যমে। রবীন্দ্রসঙ্গীতের পরিবেশন পদ্ধতি নিয়ে শিল্পী বলেছেন—

"... স্বরলিপির বাঁধুনিকে লঙ্ঘন না করে এবং রবীন্দ্রনাথের

নির্দেশ অগ্রাহ্য না করেও তো শিল্পী তার আপন মহিমায় স্বতন্ত্র হয়ে উঠতে পারেন যদি তিনি তার নিজের মানসিক কর্ষণের সাহায্যে রবীন্দ্রনাথ ও তাঁর গানের যথার্থ তাৎপর্যটি হৃদয়ঙ্গম করে তা ব্যক্ত করার জন্য সচেষ্ট হন। যাঁরা এ কাজ পেরেছেন বা পারেন তাঁরাই প্রকৃত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পীর স্বীকৃতি লাভ করেছেন।"[৩১]

রবীন্দ্রনাথের গান সম্পর্কে এই যুগবাহক শিল্পীর অন্তর্বিশ্লেষণ হল—

"রবীন্দ্রনাথের গানের সেবা করেছি সারা জীবন— যে গানে ভাব ও সুরের হরগৌরী মিলন, যে গান 'যুগলসম্মিলনে পূর্ণ প্রকাশিছে' তাঁর দিগন্তপ্লাবী সুরের ধারায় আস্নাত আমরা কোন্ সুর নিজেরা রচনা করব? আমরা কেবল কবির ভাষা ও সুরেই বলতে পারি—'হারিয়ে গেছে মোর বাঁশি, আমি কোন সুরে ডাকি তোমারে?' যে সুরেই ডাকি, সে তো তাঁরই সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পরবর্তী যুগের কবি সাহিত্যিকদের সঙ্গে সুরকারদেরও চির ম্লান করে দিয়ে গেছেন। তাঁর সম্মুখে বিস্ময়ে নতজানু হয়েই আমাদের মুক্তি।"[৩২]

গ্রন্থ মধ্যে আলোচকের বক্তব্যের মধ্য দিয়ে রবীন্দ্রসঙ্গীতের এক নিষ্ণাত শিল্পীকে খুঁজে পাওয়া যায়।

লক্ষণীয় বিষয় এই যে, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক আলোচনা, সমালোচনা বা গবেষণামূলক যে সমস্ত গ্রন্থ আমরা আলোচ্য সন্দর্ভে পর্যালোচনা করার চেষ্টা করেছি, তার মধ্যে অনেকগুলো গ্রন্থের লেখকই প্রাতিষ্ঠানিক বিদ্যায়তনিক গবেষক হিসেবে পরিচিত নন। তাঁরা অনেকেই প্রধানত রবীন্দ্রসঙ্গীত শিল্পী বা শিক্ষক। অথচ

শুধু প্রাণের তাগিদেই বা অসীম ভালোবাসার জোরে রবীন্দ্রসঙ্গীত বিষয়ক অপূর্বসুন্দর গবেষণাধর্মী গ্রন্থ রচনা করেছেন আপন অভিজ্ঞতা ও অনুভবের গাঢ়তার জন্যে। তা আজকাল ভাবাই যায় না।

সূত্রনির্দেশ—

১। অমল মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত পরিক্রমা, করুণা প্রকাশনী, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৮১, পৃঃ-১১৬-১১৭।

২। তদেব, পৃঃ-৫১।

৩। তদেব, পৃঃ-১১২।

৪। শান্তিদেব ঘোষ, রবীন্দ্রসঙ্গীত বিচিত্রা, আনন্দ, কলকাতা, এপ্রিল ২০০৮, পৃঃ-১৬০।

৫। তদেব, পৃঃ-৭৭

৬। তদেব, পৃঃ-১০৭-১০৮

৭। তদেব, পৃঃ- ১০৮

৮। তদেব, পৃঃ-১১৩

৯। কিরণশশী দে, রবীন্দ্রসঙ্গীত সুষমা, দে'জ, কলকাতা, জুলাই ১৯৯৮, পৃঃ-৩৫-৩৮।

১০। তদেব, পৃঃ-৪৪-৪৫।

১১। তদেব, পৃঃ-৯৫।

১২। আবু সয়ীদ আইয়ূব, পান্থজনের সখা, দে'জ, কলকাতা, ডিসেম্বর ১৯৯৭, পৃঃ-১৫-১৬।

১৩। তদেব, পৃঃ-৩০।

১৪। তদেব, পৃঃ- ১২০।

১৫। অমিয়কুমার সেন ও নীলিমা সেন, সুরের গুরু, অনন্য, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃঃ-১০-৩১।

১৬। কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বীরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, রবীন্দ্রসঙ্গীত ঃ কাব্য ও সুর, শঙ্খ প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৯৬, পৃঃ-২৩০।

১৭। তদেব, পৃঃ-২৫০-২৫১।

১৮। কিরণশশী দে, রবীন্দ্রসঙ্গীতের প্রামাণ্য সুর, দে'জ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০০০, পৃঃ-৪৫-৪৬।

১৯। তদেব, পৃঃ-৬৮।

২০। তদেব, পৃঃ-৬৯।

২১। তদেব, পৃঃ-৭৭।

২২। তদেব, পৃঃ-১১৬।

২৩। ড. অরুণ কুমার বসু, বাংলা কাব্যসঙ্গীত ও রবীন্দ্রসঙ্গীত, দে'জ, কলকাতা, ডিসেম্বর ২০১০, পৃঃ-৫৭১।

২৪। তদেব, পৃঃ-২৮৭।

২৫। তদেব, পৃঃ-২৮৯।

২৬। সাহানা দেবী, স্মৃতির খেয়া, প্রাইমা পাবলিকেশন, কলকাতা সেপ্টেম্বর ১৯৯২, পৃঃ-১৪১।

২৭। তদেব, পৃঃ-১২৬।

২৮। তদেব, পৃঃ- ১২৮।

২৯। তদেব, পৃঃ-১৯২।

৩০। শঙ্খ ঘোষ, এ আমির আবরণ, প্যাপিরাস, কলকাতা, নভেম্বর ২০০২, পৃঃ-৫৯।

৩১। পঙ্কজ কুমার মল্লিক, আমার যুগ আমার গান, ফার্মা কে এল এম প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃঃ-২২৫-২২৬।

৩২। তদেব, পৃঃ-২২৩।